বিদেশী অর্থের উপর বাংলাদেশ কতটুকু নির্ভরশীল?

- ডালিয়া সাত্তার

সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশী ঋণদাতা সংস্থা ও দেশসমূহের বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপের বিষয়টি খুব বেশী আলোচিত হচ্ছে। বিষয়টি বেশী উঠে এসেছে প্রধানমন্ত্রীর সংসদে দেয়া বক্তৃতাকে কেন্দ্র করে। অনেকে প্রধানমন্ত্রীকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এ বিষয়ে শক্ত অবস্থান নেয়ার জন্য। অনেকে আবার এর মধ্যে বিপদের আভাস দেখতে পাচ্ছেন কেননা আমাদের বাজেটের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও বিদেশী উৎস থেকে এসে থাকে। এরকম পরিস্থিতিতে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করে দেখা প্রয়োজন যে, যদি সত্যিই বিশ্বব্যাংক, আই এম এফ, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য সংস্থা ও দেশ বাংলাদেশকে অর্থ সহায়তা বন্ধ করে দেয় তাহলে কি অবস্থা হবে। খতিয়ে দেখা দরকার যে, আমরা বিদেশী অর্থের উপর প্রকৃতপক্ষে কতটুকু নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা দূর করা কতটুকু ও কিভাবে সম্ভব তাও খুঁজে দেখা প্রয়োজন কেননা, পরনির্ভরশীল হয়ে থাকবার জন্য আমরা স্বাধীনতা আনিনি।

২০০৪-০৫ সালের বাজেটে বিদেশী সহায়তার পরিমান ধরা হয়েছিল নয় হাজার (৮৮৪৯) কোটি টাকার মত যার মধ্যে ঋণের পরিমান ছিল সাত হাজার (৬৯৬০) কোটি টাকা, বাকিটা অনুদান। উক্ত অর্থ বছরে সরকারের মোট বাজেট ছিল সাতান্ন হাজার (৫৭,২৪৮) কোটি টাকা। (সূত্রঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ‘বাজেটের সংক্ষিপ্তসার’)। এ হিসাবে আমাদের সরকারী বাজেটের শতকরা পনের ভাগের জোগান আসে বিদেশী অর্থ থেকে।

তবে এ হিসাবে যে মারপ্যাঁচ আছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ তো বটেই, সরকারের নীতি নির্ধারকগনের অনেকেই জানেন না। নয় হাজার কোটি টাকার বিদেশী অর্থের মধ্যে দুই হাজার (১৮৮৯) কোটি টাকা হচ্ছে অনুদান, যা শোধ দিতে হয় না। অনুদান দেয়া হয় কারিগরি সহায়তা মূলক প্রকল্পে। রাস্তাঘাট বা অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ, যন্ত্রপাতি কেনা ইত্যাদি খাতে অনুদান দেয়া হয় না। এ অর্থ ব্যয় করা হয় সরকারকে পরামর্শ দেবার কাজে। কারিগরি সহায়তা মূলক প্রকল্পের সিংহভাগ (৭০ শতাংশের মত) খরচ হয় বিদেশী পরামর্শকদের জন্য। যেখানে সরকারের একজন সচিব মাসে বেতন পান হাজার পনের টাকার মত সেখানে একজন বিদেশী পরামর্শককে দিতে হয় মাসে দশ লাখের মত। অর্থাৎ, একজন বিদেশী পরামর্শকের বেতন বাংলাদেশের সকল সচিবের বেতনের যোগফল থেকেও বেশী। মুজতবা আলী বেচে থাকলে হয়তো প্রশ্ন করতেন যে, বিদেশী পরামর্শকের এক ঠ্যাংএর সমান বাংলাদেশের কতজন সচিব!

এত দামী পরামর্শকেরা কতটুকু অবদান রাখেন আমাদের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে? অধিকাংশ বিদেশী পরামর্শকেরই পর্যাপ্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকে না। এদের অনেকে পাশ করেই চলে আসেন সরকারকে বুদ্ধি দিতে। অভিজ্ঞতা সম্পন্নদের পক্ষেও অতি অল্প সময়ের মধ্যে এদেশের সকল কিছু বুঝে, তার যথার্থ সমাধান করার পথ বের করা খুবই দূরুহ। যেমন, ইতালী থেকে এসে তিন মাসের মধ্যে বাংলাদেশের সরকারী খাতের কেনা-কাটার যাবতীয় খুটিনাটি বুঝে, এদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট জেনে বাংলাদেশ সরকারের ক্রয় নীতিমালা তৈরী করা কতটুকু সম্ভব? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা অন্য দেশের জন্য তৈরী করা সমাধান, দেশের নাম আর সংশ্লিষ্ট কিছু পরিবর্তন করে বাংলাদেশের জন্য চালিয়ে দেয়। সরকারকে তা পরে বাধ্য হয়ে মানতে হয়। তাতে কখনও কখনও

বড় ধরনের বিপর্যয়ও ঘটে। বিদেশী পরামর্শকদের মূল্যবান পরামর্শ মানতে গিয়ে দেশের সরকারী স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাত মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

কারিগরী সহায়তা মূলক প্রকল্পের বাকী অংশের সিংহভাগ ব্যায় হয় দেশীয় পরামর্শকদের বেতন ও সরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের শিক্ষা সফরের নামে বিদেশ ভ্রমণ বাবদ। শিক্ষা সফরের বিষযটিও যথেষ্ট কৌতূহল উদ্দীপক। যেমন, বাংলাদেশে সরকারের ক্রয় নীতি শিখতে যেতে হবে ইতালী কিংবা কানাডা! এভাবে শিক্ষা সফরের টাকাটির বড় অংশও বিদেশীদের পকেটে যায়। বাকী যে ৫-১০ ভাগ থাকে তা খরচ হয় কিছু কম্পিউটার ও অন্যান্য অফিস সরঞ্জাম কেনা ও আনুসাঙ্গিক খাত বাবদ। ফলে বিদেশী অনুদানের মাত্র শতকরা বিশ ভাগের মত অর্থ দেশে থাকে। বাকীটা বিদেশী পরামর্শকদের বেতন, কর্মকর্তাদের শিক্ষা সফর ইত্যাদিতে আবার বিদেশেই চলে যায়। বিদেশী পরামর্শকদের মূল্যবান পরামর্শ দেশের খুব কমই কাজে লেগে থাকে।

অনুদানের টাকার শতকরা যে বিশ ভাগের মত দেশে থাকে, তাতে দেশের কতটুকু উপকার হয় সেটি নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। দেশীয় পরামর্শক হিসাবে কাজ করেন সরকারের বর্তমান ও সাবেক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগন। তারাই দেশে রয়ে যাওয়া অনুদানের টাকাটির বেশীরভাগ পেয়ে থাকেন। যে সরকারী কর্মকর্তাটি মাসে চৌদ্দ - পনের হাজার টাকা পেতেন, তিনিই পরামর্শক হবার পর পান দেড়-দুই লাখ টাকা। তার সহকর্মীরা চেয়ে চেয়ে দেখেন। শুরু হয় সহকর্মীদের মধ্যে কোন্দল; ক্ষতিগ্রস্থ হয় চেইন অব কমান্ড। তাছাড়া, হাতে গোনা কজন মানুষের লাখ লাখ টাকা আয় করাটাকে কোনভাবেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যায় না। বরং এর মাধ্যমে খুব অল্পদামে দেশের শীর্ষ আমলাদেরকে বিদেশীদের কাছে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়।

অনুদান হিসাবে যে টাকা সরকার পেয়ে থাকে বলে প্রচার করা হয়, তা আসলে সরকার ছুয়েও দেখতে পারে না। যে সংস্থা টাকাটি দেয়, সে নিজেই খরচ করে। কেউ কেউ সরকারকে খরচের পরিমানটা বলে, কেউ বা বলার প্রয়োজন মনে করে না। উল্টো তাদের দয়ার দানে দেশটি চলছে এবং সে জন্য তারা বাংলাদেশের মাথা কিনে নিয়েছে - এরকম একটা মানসিকতা তাদের আচরনে ফুটে ওঠে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, অনুদান হিসাবে যে পরিমান অর্থ সরকার পেয়ে থাকে বলে জানানো হয়, তা আসলে দেশের কোন কাজে যে আসেনা তাই নয়, বরং তার জন্য দেশ ও সরকারকে নানান ঝামেলা পোহাতে হয়। দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়, সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে অন্তঃকলহ বৃদ্ধি পায় ও দেশের স্বার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। দেশের মানুষের মধ্যে জাতীয় হীনমন্যতার জন্ম হয়। সুতরাং, সরকার খুব সহজেই অনুদানের অংশটি বাজেট থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারে।

অনুদানের অংশটি বাদ দিলে বিদেশী অর্থের (ঋণের) পরিমাণ দাড়ায় সাত হাজার কোটি টাকার মত, যা আমাদের বাজেটের শতকরা মাত্র বারো ভাগ।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঋণের টাকা বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে খরচ হলেও তা সরকারের নিয়মিত হিসাব রক্ষণ চ্যানেলে হয় না। এসব ক্ষেত্রে সরাররি ঋণদাতা সংস্থা ও প্রকল্পের কর্মকর্তাদের মধ্যে লেনদেন হয়। এই খাতটি দূর্নীতি ও অপচয়ের সবথেকে বড় আখড়া। কিছুদিন আগে দূনীতি দমন কমিশন শত শত সরকারী গাড়ীর বর্তমান হাল জানতে চেয়ে মন্ত্রণাগুলোতে লিখে নিজের কপাল পুড়িয়েছিল। ঋণ করে এসব দামী গাড়ির বহর কেনা হয়েছিল দারিদ্র নিরসনের জন্য। সে গাড়ী পরে ভাগ হয়ে যায় মন্ত্রী, সচিব,

উদ্ধতন কর্মকর্তা ও প্রকল্পের কর্তাদের মধ্যে। ব্যবহৃত হয় তাদের বিবি সাহেবাগনের শপিং, ভ্রমণ, ছেলেমেয়েদের স্কুলে আনা-নেওয়া ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে। এখানেই শেষ নয়, প্রকল্প শেষ হয়ে গেলে কিছুদিন বিভিন্ন খাত থেকে তেল যোগড় করে গাড়ীগুলো চালানো হয়। তারপর যখন মেরামতের প্রয়োজন পড়ে তখন অফিসগুলোর কোনায় কোনায় ফেলে রাখা হয়। গাড়ীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চুরি হয়ে যেতে থাকে এবং ঋণের টাকায় কেনা গাড়ীতে একসময় লতা গুল্ম জন্মাতে থাকে। পরিকল্পনা কমিশন ও অন্যান্য অনেক সরকারী অফিসে এরকম গাড়ীর ভাগাড় দেখতে পাওয়া যায়।

বৈদেশিক অর্থ খরচ হয় উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে। প্রকল্পের বাজেট, হিসাব ব্যবস্থা ও খরচের পথ সরকারের নিয়মিত বাজেট থেকে ভিন্ন ও অস্বচ্ছ। সরকারের নিয়মিত বাজেটে খরচের খাত (যেমন কর্মকর্তাদের বেতন, বাড়ী ভাড়া, বিদ্যুৎ বিল, স্টেশনারী ক্রয়, গাড়ি ক্রয় এরূপ কয়েকশত খাত) সুনিদৃষ্ট ভাবে উল্লেখ থাকে। কিন্তু উন্নয়ন বাজেটের ক্ষেত্রে তা হয় না। প্রত্যেক প্রকল্পের বাজেট শুধুমাত্র রাজস্ব ও মূলধন - এ দুই খাতে দেখানো হয়। ফলে, পরামর্শকদের বেতন বাবদ কত খরচ হচ্ছে আর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণবাবদ কত খরচ হচ্ছে তা কারোই জানার উপায় থাকে না। অস্বচ্ছতার কারনে দূর্ণীতি যেমন সহজেই বিস্তৃত হতে পারে, তেমনি ব্যয় নিয়ন্ত্রনের কোন উদ্যোগও সফল হয় না।

বৈদেশিক ঋণের আরেকটি অপচয়ের ক্ষেত্র হচ্ছে ঋণদাতার বেধে দেয়া শর্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকার বাধ্য হয় বিদেশী কোম্পানীদেরকেই কাজ দিতে। সম্প্রতি ঢাকাতে দুটি ফ্লাইওভার তৈরী হয়েছে। একটি হয়েছে সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের টাকায় দেশী কোম্পানীকে দিয়ে আর অন্যটি বিদেশী ঋণে বিদেশী কোম্পানীর দ্বারা। বিদেশী অর্থে তৈরী মহাখালী ফ্লাইওভারের দৈর্ঘ্য ১.১২ কি.মি. আর খরচ ১১৬ কোটি টাকা অথচ দেশী অর্থে দেশীয় কোম্পানী দিয়ে তৈরী খিলগাও ফ্লাইওভারের দৈর্ঘ্য ১.৯ কি.মি. আর খরচ ৮১ কোটি টাকা। বিদেশী অর্থের যে কত অপচয় হয়, এটি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরন।

বৈদেশিক ঋণের অপচয় ও দূর্ণীতির পরিমান কোন ক্রমেই শতকরা পঞ্চাশ ভাগের কম নয়। সে হিসাবে কার্যকর বিদেশী ঋণ দাড়ায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার মত যা আমাদের বাজেটের শতকরা মাত্র ছয় ভাগ। গত বছরের বন্যার সময় সরকার অপ্রয়োজনীয় খরচ কিছুটা কমিয়ে কয়েক হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করে এবং তা দিয়ে বন্যা মোকাবেলা করে। সরকারী খাতের সীমাহীন অপচয় কিছুটা কমিয়ে খুব সহজেই দেশী উৎস থেকে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা যোগান দেয়া সম্ভব।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিদেশী অর্থের উপর দেশের সাধারন জনগনের কার্যকর নির্ভরতা খুবই কম এবং তা খুব সহজেই দূর করা সম্ভব। তবে সেজন্য প্রয়োজন প্রকল্প ব্যয়ে অস্বচ্ছতা ও দূর্ণীতি বন্ধ করা। তবে যে দেশে দলের নমিনেশন প্রকাশ্যে কেনা বেচা হয় ও দূর্নীতি মন্ত্রীত্বের অলংকার হিসাবে বিবেচিত হয়, সে দেশে দূর্ণীতি কমানো ও স্বচ্ছতা বাড়ানোর প্রস্তাব কতটুকু বাস্তবসম্মত তা বিবেচনার দাবী রাখে বৈকি।